Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 04
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 20 - 30
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 20 - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কালিকার স্বরূপ সন্ধান

মানিক মৈত্র
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বহরমপুর গার্লস কলেজ
ও
গবেষক, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : manikmaitra40@gmail.com
0000-0002-8038-8871

Received Date 28. 09. 2025
Selection Date 15. 10. 2025

Keyword
ভাগবত, মার্কন্ডেয় পুরাণ, হ্লাদিনী শক্তি, বিপদতারিণী, দুর্গামঙ্গল, কালিকামঙ্গল, তন্ত্র শাস্ত্র, দশমহাবিদ্যা।

Abstract
তুর্কি আক্রমণের পর থেকে ইংরেজ আগমন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য অনেক ধারায় বিভক্ত ছিল। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বৈষ্ণব সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য এবং মঙ্গলকাব্য। লক্ষণীয় এই সময়কার মানুষ সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক যে কোন কারণেরই হোক না কেন, তারা এক নারী শক্তি তথা আদ্যাশক্তির অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন। মূলত মঙ্গলকাব্যগুলিতে এই প্রচেষ্টার সার্থক প্রয়াস লক্ষ্য করা গেলেও বৈষ্ণব সাহিত্য এবং অনুবাদ সাহিত্যেও এই সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে ছিল। পরবর্তী সময়ে কালিকামঙ্গল এবং আরো পরে শাক্ত পদাবলীতে যে কালিকার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে তা মূলত উক্ত প্রয়াসের সার্থক সাহিত্যরূপ। আমার এই প্রবন্ধে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিভিন্ন সাহিত্য অবলম্বনে আদ্যাশক্তি কালিকার সেই স্বরূপ অন্বেষণের চেষ্টা করেছি।

Discussion
সভ্যতার ঊষাকাল থেকেই প্রকৃতির বিভিন্ন বৈচিত্র্যকে উপলব্ধি করতে করতে মানুষের মনে বিভিন্ন রকম ধারণা দানা বাঁধতে থাকে। জাগতিক সকল কার্য-কারণের মধ্যে ব্যক্তি এক শক্তির উপস্থিতি অনুভব করতে থাকে। পরবর্তীকালে শক্তিবোধই মানুষের দর্শন চিন্তায়, ধর্মবোধে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিতে থাকে। এভাবেই ব্যক্তি নিজ খেয়ালে জগৎ সৃষ্টির মুলেও শক্তিকে উপলব্ধি করতে থাকে। জগত সৃষ্টির রহস্যানুসন্ধানের চেষ্টা এবং জীবন সম্বন্ধে গভীর চিন্তার ফলে ব্যক্তি মনে ঈশ্বর ভাবনার উদ্ভব হতে থাকে। এই রহস্য অনুসন্ধানের স্পৃহাই আদিকালের মানুষকে ঈশ্বরের পিতৃভাব ও মাতৃভাবের ভাবনা ও তার রূপকল্পনায় প্রণোদিত করে। কাল পরিক্রমায় মানুষের মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে অনুভব করে পৃথিবীর সব বস্তুর মধ্যেই রয়েছে শক্তির উপস্থিতি। ব্যক্তি ক্রমশ সেই শক্তিরই উপাসক হয়ে উঠেছে। তাই সেই অনাদি অতীতকাল থেকে আজ পর্যন্ত হিন্দুধর্মে নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে শক্তিতত্ত্বরই সম্যক অনুশীলন লক্ষ্য করা যায়। শক্তিতত্ত্বর এই ঐতিহ্য বহু প্রাচীন এবং সেই ঐতিহ্য-সূত্র বহন করেই বাংলায় শক্তিদেবীর উদ্ভব। ভারতীয় ঐতিহ্যে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 04
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 20 - 30
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শক্তিদেবী তথা মাতৃ আরাধনার এক ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়। এই ধারাবাহিকতা থেকে শক্তিদেবী তথা মাতৃ আরাধনার বিবর্তন খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, রামায়ণ ও মহাভারতের মতো মহাকাব্যাদি, তন্ত্রশাস্ত্র, বৌদ্ধতন্ত্র, সংস্কৃত সাহিত্য, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত প্রকীর্ণ কবিতাবলিতে শক্তিদেবীর স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্যগুলিতেও শক্তিদেবীর নির্দিষ্ট রূপ লক্ষ্য করা যায়। লক্ষণীয় কোন একটি উৎসই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, বরং পূর্ববর্তী উৎসকে অঙ্গীকার করেই পরবর্তীকালে শক্তিদেবীর বিভিন্ন রূপ গড়ে উঠেছে।

ভারতীয় আর্যেতর সংস্কৃতিতে তন্ত্রাচার এক বিশিষ্ট মাধ্যম। এই তন্ত্রশাস্ত্রে মাতৃদেবীর মহিমা বিশেষভাবে কীর্তিত হয়েছে। তন্ত্রে বিভিন্ন দেবতার পূজা ও আরাধনার কথা বলা হলেও শক্তিই প্রধান দেবী। এই শক্তি মাতৃকা শক্তি বা স্ত্রী-শক্তি। পৌরাণিক ও লৌকিক দেবীরা বস্তুতপক্ষে এই শক্তি দেবীরই নামান্তর ও রূপান্তর। তন্ত্রশাস্ত্রে প্রকৃতপক্ষে আর্য ও অনার্য শক্তিসাধনার মিশ্রণ ঘটেছে। তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হয়েছে, দশমহাবিদ্যার মধ্যে কালী শুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রধানা নির্বিকারা নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশিকা। ইনি আদিরূপা ও সাক্ষাৎ কৈবল্যদায়িনী। দশমহাবিদ্যা প্রকৃতপক্ষে এই মিশ্রিত শক্তিদেবীর বিভিন্ন রূপের পরিচয় মাত্র। সমস্ত সিদ্ধ বিদ্যার মধ্যে দক্ষিণা কালী সকলের প্রধানা। ভারতীয় সংস্কৃতিতে দেব-দেবীর রূপের সংখ্যা যেমন অসংখ্য তাঁদের প্রকাশও তেমন বিচিত্র। দেবী কখনও ভয়ঙ্করী, কখনও প্রশান্ত; কখনও তিনি দ্বিভুজা, কখনও বা চতুর্ভুজা, ষড়ভুজা, অষ্টভুজা অথবা দশভুজা। জগজ্জননীর শত সহস্র রূপের মধ্যে শক্তি-সাধকগন বিশেষ করে 'দশমহাবিদ্যার' উপাসনা করে থাকেন —

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধুমাবতী তথা।।
বগলা সিদ্ধ বিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতাদশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধ বিদ্যাঃ প্রকীর্তিতা।।[১]

আদ্যাশক্তি জগদ্ধাত্রীর রূপ কল্পনায় সম্ভবত সতী রূপই প্রথম। পরবর্তীকালে চণ্ডী, পার্বতী, দুর্গা প্রভৃতির মধ্যদিয়ে কালিকা রূপই ব্যক্তি মনে বিশেষভাবে জায়গা করে নিয়েছে। চণ্ডীপুরাণ অনুসারে চণ্ডীকা রূপ থেকেই রক্তবীজ বিনাশিনী কালী-রূপের সৃষ্টি। রূপকল্পনায় কালিকামূর্তি সতী, পার্বতী প্রভৃতি অপেক্ষা আধুনিক হলেও 'কালী' শব্দটি কিন্তু প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে প্রচলিত ছিল। 'কালী' শব্দটি শক্তিতত্ত্বেই ব্যবহৃত হতো। কালীর ধারণা যদিও মণ্ডুক উপনিষদে আছে। অন্যভাবে কালীমূর্তির কল্পনা রাত্রিসূক্তেও আছে। পরবর্তী মহাকাব্যের যুগে মহাভারতের অনুশীলন পর্বে সাবিত্রী ও দুর্গা স্তোত্র রয়েছে, রাত্রি সূক্তের সাবিত্রী মন্ত্র ও দুর্গামন্ত্রের সঙ্গে যার খুবই মিল আছে। বলা বাহুল্য এগুলি শক্তিমন্ত্র। সুতরাং এগুলি গভীরভাবে বিচার করলে স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায় যে, ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক চেতনার আরম্ভকাল থেকেই শক্তি সাধনার ধারা বহমান। লক্ষ্মী, অদিতি, সরস্বতী, সাবিত্রী, রাত্রি ও উষার ধারণা থেকে ক্রমে ক্রমে শ্রীশ্রীচণ্ডীর কল্পনা। তারপর দুর্গা বা পার্বতী এবং পরিশেষে কালিকা রূপ। দশমহাবিদ্যার কথা আমরা সকলেই জানি। এই কালীই দশমহাবিদ্যার প্রথমা দেবী।

শক্তি সাহিত্যের প্রধান উৎস তন্ত্র সাহিত্য হলেও তা একমাত্র উৎস নয়। বেদ, পুরাণ, ভারতীয় দর্শন, সংস্কৃত সাহিত্য – মহাকাব্য ও কাব্যনাটকাদি, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত প্রকীর্ণ কবিতা, বাংলাসাহিত্যে চর্যাপদ থেকে মঙ্গলকাব্য, অনুবাদসাহিত্য ও বৈষ্ণবসাহিত্যে শক্তি দেবীর বীজ রয়েছে বলে অনুমান করা যায়। শক্তি দেবীর উৎস প্রসঙ্গে সমালোচক বিকাশ পাল তাঁর 'শক্তিতত্ত্ব ও শাক্তপদাবলী' গ্রন্থে লিখেছেন —

> "বৈদিক সাহিত্যে ঋগবেদের দেবীসূক্ত, রাত্রিসূক্ত; সামবেদের রাত্রিসূক্তে শক্তিতত্ত্ব তথা শক্তিবাদের উৎস নিহিত আছে। দেবীসূক্তে পরমাত্মার বিশ্বব্যাপিনী রূপের কথা পাওয়া যায়, তা যেমন শক্তিদেবীর রূপকল্প নির্মাণে সহায়তা করেছে, তেমনি রাত্রিসূক্ত কালীমূর্তির রূপ পরিকল্পনায় সাহায্য করেছে। ঋগ্‌বেদের রাত্রিসূক্ত কিভাবে পরবর্তীকালে শক্তিদেবী তথা মাতৃদেবীর সঙ্গে মিশে গিয়েছে তা বলা কঠিন। ঋগবেদেই রাত্রিকে দেবীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। শুক্লযজুর্বেদে দ্যুলোক, ভূলোকে অন্ধকারে আচ্ছন্নকারিণী রাত্রিদেবীর স্তব করা হয়েছে, অথর্ববেদেও রাত্রির স্তব দেখা যায়। বিভিন্ন পুরাণ-উপপুরাণগুলির মধ্যে দেবীভাগবত, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, কালিকাপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও শক্তিদেবী সম্পর্কে

> নানা তথ্য পাওয়া যায়। দেবীপুরাণে রাত্রিদেবীকে 'ব্রহ্মমায়াত্মিকা', 'পরমেশলয়াত্মিকা' বলা হয়েছে। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে যে 'কালরাত্রিমহারাত্রি মোহরাত্রিশ্চ দারুণা' বলা হয়েছে দেবীকে, তিনিই সম্ভবত অর্থাৎ কালরাত্রিই সম্ভবত কালীতে পরিণত হয়েছে।"[২]

প্রাচীন বাংলার কাল-পর্ব অতিক্রম করে মধ্যযুগের বাংলায় সাহিত্যের প্রধান তিনটি শ্রেণি লক্ষ্য করা যায়। সেগুলিতে তথা অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণব পদাবলী। এই কাব্যগুলিতে শক্তিধর্ম বৈদিকী ব্রাহ্মণ্য পরিমণ্ডল ছেড়ে লোকায়ত জীবন দর্শনের আলোকে প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক ডক্টর ভক্তি দে মহাশয় তার 'শক্তি সাধনার উত্তরাধিকার ও বৌদ্ধ সহজ সাধনা' গ্রন্থে লিখেছেন —

> "বাংলার জাতীয় উপাদানে সমৃদ্ধ উপরোক্ত লোকায়ত সাহিত্যগুলিতে আত্মশক্তির উদ্বোধনের কোন কথা নেই বরং প্রতিপদক্ষেপে এক অচিন্ত্যনীয় মহাশক্তির কাছে নিবেদিত সত্ত্বার বরাভয়ের প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে। এই আত্মনিবেদনের পথ ধরে মহাদেবী ভয় ভক্তির উচ্চাসন থেকে ক্রমে বিশ্বমাতৃত্বের করুণাময়ী সত্ত্বায় রূপান্তরিত হয়েছেন। জগজ্জনীর এই রূপান্তরিত সত্ত্বার আনুষঙ্গিকে, মা ও সন্তানের মান, অভিমান, হাসি, কান্নার ঘরোয়া পারিবারিক সম্পর্কগুলি, কাহিনীর বিন্যাসে উপরোক্ত সাহিত্যগুলিতে বৈশিষ্ট্যলাভ করেছে।"[৩]

চর্যাপদ রচনার পরেও দেড়শ বছর পর্যন্ত বাঙালীর ভাব-জীবনের কোন পরিচয় আমরা তেমনভাবে পাইনি। ইলিয়াস শাহী রাজত্বকাল থেকেই বস্তুতঃ বাঙালীকে সাহিত্য চর্চায় পুনরায় দেখা যায়। সেই সাহিত্যের বিষয়বস্তু একদিকে যেমন নেওয়া হয়েছে সমসাময়িক সমাজ-জীবনে নবাগত সমন্বয়জাত ভাবধারা ও আচার-আচরণ থেকে, তেমনি অপরদিকে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যাগত সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন মহাকাব্য ও পুরাণ থেকে। এরকমই এক প্রেক্ষাপটে অনুবাদ সাহিত্যের সূচনা। এ প্রসঙ্গে সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' গ্রন্থ লিখেছেন —

> "পঞ্চদশ ও পরবর্তী শতাব্দীর হিন্দুসমাজ ও সংস্কৃতির পুনর্গঠনে অনুবাদ সাহিত্য বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। কারণ দু'শ বৎসরব্যাপী (১২ দশ - ১৪ দশ শতাব্দী) পাঠান শাসনে বাংলার হিন্দুসমাজে যে ভাঙ্গন ধরেছিল তাকে গড়ে তুলতে হলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের আদর্শ, নীতি, তত্ত্ব ও কাহিনীর পুনঃপ্রচারের আবশ্যকতা সে যুগের সমাজনেতারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা আরও বুঝতে পেরেছিলেন, শুধু জীমূতবাহনের স্মৃতিশাস্ত্রের অযুত বাঁধনে বাঁধলে হিন্দু সমাজকে দুর্গতির হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না। হিন্দুসমাজের সর্বশ্রেণীর মধ্যে নিজ নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনতে হলে পৌরাণিকসাহিত্য, বিশেষতঃ রামায়ণ মহাভারতের প্রচার অত্যাবশ্যক। তাই তাঁরা জনসমাজে অনুবাদের মধ্য দিয়ে রামায়ণ, মহাভারত, ও অন্যান্য পৌরাণিক সাহিত্যের মূল নির্যাস প্রচারে, ব্রতী হয়েছিলেন।"[৪]

মন্তব্যটির সূত্রধরে রামায়ণে কিভাবে শক্তি দেবীর বীজ লুকিয়ে রয়েছে তা অনুসন্ধান করা যেতে পারে। উল্লেখ্য কৃত্তিবাসী রামায়ণের কথা। এখানে তথ্য অপেক্ষা ভাবের লালিত্য অধিক প্রাধান্য পেয়েছে। কাব্যে মূল কাহিনির সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রায়নের রূপরেখাটিও প্রয়োজনবোধে পরিশীলিত এবং ঘরোয়া আঙ্গিকে পরিবেশিত হয়েছে। তাই প্রবল পরাক্রম রাক্ষসাধিপতি লঙ্কেশ রাবণও আপন শৌর্য-বীর্যে আস্থা না রেখে দৈবী শক্তির শরণাপন্ন হয়েছেন। কৃত্তিবাস প্রসঙ্গটি করুণ অথচ সুন্দর করে কাব্য মাধুর্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। রঘুপতি রামচন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত করার জন্য রাবণ দেবী অম্বিকাকে স্তবে তুষ্ট করতে চেয়েছেন। কারণ রাক্ষসরাজ রাবণ অম্বিকার একান্ত শরণাগতভক্ত। —

> "কোথা মা তারিণী তারা হওগো সদয়।
> দেখা দিয়ে রক্ষা কর মোরে অসময়।।
> পতিত পাবণী পাপহারিণী কালিকে।
> দীনজন জননী মা জগৎ পালিকে।।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 04
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 20 - 30
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

করুণানয়নে চাহ কাতর কিঙ্করে।
ঠেকিয়াছি ঘোরদায়ে রামের সমরে।।”[৫]

ভক্তের জীবন রক্ষায় দেবীর দায়বদ্ধতা সর্বদাই স্মরণযোগ্য। তাই শরণাগত ভক্তকে সংকট থেকে রক্ষা করার জন্য দেবী তাঁর কল্যাণ হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছেন। কবির কাব্যে প্রসঙ্গটির মধুর বর্ণনা চিত্রিত হয়েছে। রাবণের স্তবে তুষ্ট দেবী অম্বিকা সন্তানকে স্নেহাঞ্চলে স্থান দিয়েছেন।—

“অসিত বরণাকালী কোলে দশানন।
রূপের ছটায় ঘন তিমির নাশন।।
অলকা ঝলকা উচ্চ কাদম্বিনী কেশ।
তাহে শ্যামা রূপে নীল সৌদামিনী বেশ।।”[৬]

এবার কাশীরামদাস অনুদিত মহাভারতে শক্তিসাধনার উৎস ধারাটি অনুসন্ধান করা যেতে পারে। শক্তিতন্ত্রের আচার নিয়মের উল্লেখ, দেবীশক্তির আরাধনা এবং বিভিন্ন নারীশক্তির মহিমা কীর্তনের মাধ্যমে শক্তিতত্ত্ব ও সাধনার ইঙ্গিত পরিস্ফুট হয়েছে। কাব্যে দেখা যায় সুরপতি ইন্দ্রের শাপমোচন প্রসঙ্গে গৌতমমুনি দেবরাজকে দেবী ভবানীর মহাষ্টমী ব্রত পালনের উপদেশ দিয়েছেন। ব্রত পালনের বিস্তৃত বিবরণ দেবী নিজেই দিয়েছেন —

“কেমন করিবে ব্রত শুনহ বচন।
সপ্তমীতে সংযম করিবে নিষ্ঠাপন।।
অষ্টমীতে উপবাস করি নিরাহার।
বৈষ্ণবী ভবানী পূজি দিবে উপহার।।
বলিদান নাহি দিবে নহে ব্যবহার।
পূজিবে ভবানী দেবী দিয়া উপহার।।...
নবমীতে তমোগুণ হইয়া ভবানী।
সংসারে লয়েন পূজা সংসার কারিণী।।
ছাগাদি মহিষ মেষ দিয়া বলিদান।
করিবে ভবানী পূজা হইয়া সাবধান।।”[৭]

এই প্রসঙ্গে শচীপতি ইন্দ্রের গৌরীর স্তব বন্দনাটিও উল্লেখযোগ্য। এখানে ইন্দ্রের স্তুতি বন্দনার মধ্যে মহাশক্তি জগজ্জনীর স্বরূপ তত্ত্বটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে —

“দুঃখ বিনাশিনী মাতা হরের ঘরণী।
মোরে কৃপা কর মাতা জগত জননী।।
দুর্গতি নাশিনী মাতা করুণা দায়িনী।
অনাথ রক্ষিতা মাতা শুভ প্রদায়িনী।।...
স্বর্গ মর্ত পাতালে করয়ে তব পূজা।
আমার নিস্তার কর দেবী দশভূজা।।
হরি ব্রহ্মা শিব তোমা ধ্যায় নিরন্তর।
তোমার সেবনে হয় নিরাপদ নর।।”[৮]

এছাড়াও চরিত্র চিত্রণের নিপুনতায় এবং কাহিনি বিন্যাসের কুশলতায় বিভিন্ন নারী চরিত্রগুলি যেমন দ্রৌপদী, সাবিত্রী, সীতা, লক্ষ্মী, অদিতি, পৃথিবী, প্রমুখের মাধ্যমে শক্তি তত্ত্বের মহিমা কীর্তিত হয়েছে বিভিন্ন কবির হাতে।

চৈতন্যপূর্বযুগে রচিত ‘শ্রীমদভাগবতের’ দশম এবং একাদশ স্কন্দের কাহিনির সূত্রানুসারে মালাধর বসু তাঁর ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ কাব্য রচনা করেছিলেন। সংস্কৃত পুরাণের ভাবানুষঙ্গে কাব্যটি রচিত হওয়ায় অনিবার্যভাবে সংস্কৃত ভাগবতের বৈষ্ণবীয় কাহিনি ও ধর্মতত্ত্বের প্রাধান্য এখানে লক্ষ্য করা যায়। তবে বহুক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল রচনাশৈলীর গুণে কাব্যটিকে তিনি

কালজয়ী করে গিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি শক্তিতত্ত্বের ভারতীয় সনাতন ধারাটিকে স্বীকার করে নিয়েই কাব্য রচনায় অগ্রসর হয়েছেন। তাই বৈষ্ণবীয় রসের কাব্য হলেও কাহিনির টানে আদ্যাশক্তি মহামায়ার প্রসঙ্গটি উথাপিত হয়েছে। যেমন— 'আদ্যাকাহিনিতে' বৃন্দাবনলীলায় মহামায়া যোগমায়া রূপে মর্ত্যাগমনের ইঙ্গিত, যশোদার গর্ভে মহামায়ার জন্ম, মহামায়ার আকাশবাণী কিংবা গোপিনীদের কাত্যায়নী ব্রতপালনের মধ্যদিয়ে মহাশক্তির স্বরূপতত্ত্ব বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

বৈষ্ণবসাহিত্য মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ। শক্তিসাধনার ধারাবাহিকতায় এই সাহিত্য ও দর্শনের বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন শক্তিতত্ত্বকে অঙ্গীকার করে গড়ে উঠেছিল। পূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তিনটি শক্তিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন স্বীকার করে নিয়েছে। যথ সন্ধিনী শক্তি (সৎ শক্তি); সম্বিৎশক্তি (চিদ্‌শক্তি) এবং হ্লাদিনী শক্তি (আনন্দ শক্তি)। এগুলি অন্তরঙ্গা শক্তি নামে বৈষ্ণব দর্শনে স্বীকৃত। এছাড়াও অন্য দুটি শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। একটি মায়াশক্তি; অপরটি জীবশক্তি।

হ্লাদিনীশক্তির ঘণীভূত রূপ হল রাধারাণী। মহাভাবময়ী শ্রীরাধার প্রেমসাধনা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনকে যেমন সমৃদ্ধ করেছিল, তেমনি রাগাত্মিকা সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম, স-শক্তি প্রেমসাধনার মার্গটি উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। যা সাধন জগতে একটি নতুন দিগন্তের দিশারী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। রাধা সত্ত্বের আনন্দরূপী চৈতন্যকে জাগ্রত করে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের উজ্জীবন এবং নিত্যলীলার প্রকাশ ঘটান। —

"হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব।।
মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্বগুণ খনি সর্বকান্তা শিরোমণি।।"[৯]

এই শক্তিস্বরূপা 'হ্লাদিনী' বৈষ্ণবীয় রাগাত্মিকা গুহ্য সাধনার ধারক। এই রাগাত্মিকা প্রেমসাধনা বস্তুত শক্তিতন্ত্র নির্ভর সাধনা হিসাবে বৈষ্ণবধর্ম দর্শনে স্বীকৃত।

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রমুখ বৈষ্ণব মহাজনেরা রাগত্মিকা বৈষ্ণব সাধনায় সিদ্ধ ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বিদ্যাপতির রচনাসম্ভারে বৈষ্ণব পদাবলী ছাড়াও আরও অনেক রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। যেগুলি শাক্তধর্মের তথা শক্তিতত্ত্বের প্রত্যক্ষ ধারাটিকে বহন করে নিয়ে চলেছে। সমকালীন মৈথীলি সমাজ ও রাজন্য পৃষ্ঠপোষকতার আনুকুল্যে আপন কুলধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে বিদ্যাপতি কয়েকটি শাক্তপদ ও গ্রন্থরচনা করেছিলেন। যেমন আদ্যাশক্তি, দুর্গা, কালিকা প্রভৃতি বিষয়ে রচিত পদগুলি তাঁর শক্তিতত্ত্ব ও ধর্মের পরিচায়ক। এছাড়াও বড়ুচণ্ডীদাসের পদাবলীতে দেবী বাসুলীর শক্তিতত্ত্বকে বিশেষভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বাসুলীর আদেশে কবি বড়ুচণ্ডীদাস সহজিয়া সাধনায় সিদ্ধ হয়েছিলেন। অন্যদিকে শ্রীরাধাকে স্বরূপশক্তি রূপে গ্রহণ করে এবং সাধন ক্ষেত্রে কামগায়ত্রী বীজ গ্রহণের মধ্য দিয়ে সহজিয়া বৈষ্ণপদকর্তারা বৈষ্ণবদর্শনে শক্তিতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মঙ্গলকাব্য বাংলাসাহিত্যের সূচনাপর্বে একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরু থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর পরবর্তীকাল অবধি মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস বিস্তৃত। এই ইতিহাস স্থান, কাল, পাত্র অর্থাৎ সময়, পরিবেশ এবং বর্ণময় চরিত্রের উজ্জ্বল সমাহারে রচিত এক বৈচিত্র্যময় দলিল গাথা। ইতিহাসের সাক্ষ্য - রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের অস্থির সংকটপূর্ণ যুগসন্ধির অবসরে বাংলাসাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের আবির্ভাব ঘটেছিল। বেদ, তন্ত্র, পুরাণের আর্যসংস্কৃতি ত্যাগ করে বাংলাদেশের লৌকিক জীবন ভাবনা অবলম্বন করে, মঙ্গলকাব্যের কাহিনির বিস্তার ঘটেছে। জীবনযাত্রার এই সন্ধিক্ষণে মানুষ প্রাত্যহিক জীবনে অহরহ বিপন্নতা বোধ করত। তাই সহজ, সরল বিশ্বাসে প্রাণের আকুতিতে তাঁরা যাঁর চরণে শরণ নিয়েছিল তিনিই জগজ্জননী, বিপদতারিণী, বিশ্বপালিকা মহাদেবী। সেই মাতৃকাশক্তি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আভিজাত্যের কৌলীন্য ত্যাগ করে ঘরের মেয়ে হয়ে বাংলাদেশের ঘটে পটে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। অবশ্য একথাও উল্লেখ্য যে মঙ্গলকাব্যের কবিগণ আদ্যাশক্তি মহাদেবীর শক্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে যুগোপযোগী চিন্তাভাবনার অনুকূল স্রোতে মঙ্গলকাব্যের কাহিনিগুলিকে পরিচালিত করেছিলেন। ফলে মহাশক্তির ব্রাহ্মণ্য এবং লৌকিক এই দুই ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্ব তাঁদের কবিকল্পনায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। যার ফলশ্রুতি মঙ্গলকাব্যগুলিতে লক্ষ্য করা যায়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 04
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 20 - 30
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতেই প্রথম শক্তিদেবীর জাগরণের মধ্যে দিয়ে নারীশক্তির জাগরণ দেখা গেল। মঙ্গলকাব্যের দেবতারা লৌকিক দেবতা। একমাত্র ধর্মমঙ্গল কাব্যের ধর্মদেব ছাড়া সমস্ত মঙ্গলকাব্যের দেবতাই স্ত্রী-দেবতা। অবশ্য অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের দেবতা দক্ষিণ রায় পুরুষ দেবতা। মনসা, চণ্ডী, অন্নপূর্ণা এবং অন্যান্য অপ্রধান মঙ্গল কাব্যের দেবীরা প্রত্যেকেই শক্তিদেবীর বিভিন্ন রূপের প্রকাশ। চণ্ডীমঙ্গলের মহিষমর্দিনী মূর্তি, কালিকামঙ্গলের চামুণ্ডামূর্তি, ধর্মমঙ্গলের ভৈরবী ভীমা, ভীষণা মূর্তি। প্রকৃতপক্ষে, মনসামঙ্গলের রূঢ়মূর্তি, অমঙ্গলকারিণী মনসা যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে কোমলতর হতে হতে মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে মাতৃ-মূর্তি পেয়েছেন। প্রাকচৈতন্যযুগে আদ্যাশক্তি ও দেবী মনসার অভিন্ন স্বরূপ বিষয়ে চাঁদ সদাগরের দিব্যদৃষ্টি উন্মোচন করে মনসামঙ্গল কাব্যে বর্ণনা করা হয়েছে —

“পদ্মাবতী পূজা কর চান্দ সদাগর।
একই মূর্তি দেখ সব না ভাবিও আর।।
...
যেই জান ভগবতী সেই বিষহরি।
পদ্মার প্রসাদে আমি ভবসিন্ধু তরি।।”[১০]

দীর্ঘজীবন সংগ্রামে বিধ্বস্ত চাঁদ সদাগরের মনে এই কথার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় কাব্যের শেষ প্রান্তে এসে। যখন চাঁদ সদাগর স্তব বন্দনায় দেবী মনসাকে তুষ্ট করেছেন তখন তাঁর মনে দুয়ের ভেদ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। চাঁদ উপলব্ধি করেছেন এই বিশ্বসংসার এক অনাদি অনন্ত মহাশক্তিরই বিকাশ ও প্রকাশ মাত্র। —

“নমোনমঃ জগৎমাতা সর্বসিদ্ধিদায়িনী।
তুমি সূক্ষ্ম তুমি মোক্ষ তুমি বিশ্বজননী।।
তুমি জল তুমি স্থল চরাচরবন্দিনী।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি তুমি মূলধারিণী।।[১১]”

মনসামঙ্গলের অন্যতম জনপ্রিয় কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দও দেবী মনসাকে বিশ্বজগতের আদি কারণ রূপে চিত্রিত করেছেন। —

“আদ্যাশক্তি সনাতনী মুক্তিপদ প্রদায়িণী
জগত পূজিতা তুমি জয়া।
যার সৃষ্টি ত্রিভুবন হর মহেশের মন
আর কে বুঝিবে তব মায়া।।”[১২]

মা মনসাও চাঁদসদাগরের কাছে আপন স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশ করেছেন এইভাবে—

“আকাশ পাতাল ভূমি সৃজন সকল আমি
শক্তিরূপা সভাকার মাতা।
মহেশের মহেশ্বরী মনোরূপা সুকুমারী
লক্ষ্মীরূপা নারায়ণ যথা।।”[১৩]

কিরাত, শবরাদি প্রাচীনজনগোষ্ঠীর প্রচলিত ধ্যান ধারণা এবং সামাজিক পরিকাঠামোর উপর ভর করে নাগ সংস্কৃতি বহু প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় ধর্মের মূলস্রোতে মিশে গিয়েছিল। ফলে জন-জীবনের প্রাত্যহিক চাওয়া পাওয়া ও আশা ভরসার সূত্র ধরে নাগমাতা মনসা ভারতীয় তথা বাংলার জনসমাজে সহজেই বিশ্বের ধাতৃরূপে পূজিতা হয়েছিলেন। বস্তুত লোকবিশ্বাসের এই দৃঢ় প্রত্যয়ই কালক্রমে মহাশক্তির আবির্ভাব তথা বুনিয়াদ সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাই শুধু মনসাই নয়, চণ্ডী কমলা, উমা, লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, শীতলা প্রমুখ দেবীবৃন্দ মহাশক্তিরূপে বাঙালির জনচিত্তে ধ্যানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক মতে আনুমানিক দ্বাদশ শতকে ‘দেবীভাগবত’, ‘মার্কণ্ডেয়পুরাণ’, ‘বৃহদ্ধর্ম পুরাণ’, ‘হরিবংশ’ প্রভৃতি সংস্কৃত পুরাণ, উপপুরাণে দেবী চণ্ডীকার প্রথম উল্লেখ পাওয়া গেলেও কালক্রমে তিনি বৈদিকী দুর্গা, উমা প্রভৃতি দেবীশক্তির সঙ্গে সমীকৃতা হয়ে গিয়েছিলেন। যেমন - ‘দুর্গামঙ্গল’, ‘ভবানীমঙ্গল’ প্রভৃতি অনুদিত মঙ্গলকাব্যগুলি চণ্ডীমঙ্গলের লৌকিক

কাহিনি ত্যাগ করে সংস্কৃত মার্কণ্ডেয়পুরাণের অনুকরণে দৈবী মাহাত্ম্যের উপর জোর দিয়েছে। আবার চণ্ডীমঙ্গলের দেবী চণ্ডীকা জগজ্জননী রূপে কবিদের কাব্যে চিত্রিতা হয়েছেন। প্রসঙ্গত, চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবি মানিকদত্তের কাব্যে দেবীচণ্ডীকা আদিদেবের শক্তিরূপে বর্ণিত হয়েছেন। কাহিনির পারম্পর্যে আদ্যাশক্তি দেবী চণ্ডীকার মূর্তিরূপে প্রতিভাত হয়ে জগতে পূজিত হয়েছিলেন। তাই সর্ববিঘ্নবিনাশিনী, শান্তিদায়িনী, মুক্তিপ্রদায়িনী জগজ্জননী দেবী চণ্ডীকার স্তুতি বন্দনা চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের সমস্ত কবিদের রচনায় লক্ষ্য করা যায়। মানিক দত্ত দেবী চণ্ডীকার পূজাবিধান ও প্রশস্তি বন্দনা করেছেন এইভাবে —

"পূজহ মঙ্গল চণ্ডিকা একমন চিত্তে
হইয়া হরষিত মনে।
দুর্গারে পূজিলে বিঘ্ন খণ্ডিবে
লক্ষ্মী হবে পরসন্ন।।
বারি অবলম্বনে নানাঘটে শুভক্ষণে।
অষ্টরাত্রি সপ্তদিন পূজন।।"[১৪]

মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। কাহিনি, চরিত্র-চিত্রণ এবং মানবিক মূল্যবোধে কাব্যটি কালের সীমা অতিক্রম করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দিক দর্শন হয়ে রয়েছে। উপরন্তু সাহিত্যিক এবং কাব্যিক অলংকরণ ব্যতিরেকেও আলোচ্য কাব্যটি শাক্তধর্মের জ্বলন্ত নিদর্শন রূপেও গণ্য। কাব্যের নামকরণে (অভয়ামঙ্গল) কবির এই নৈপুণ্য শাক্তধর্মের অবিচ্ছিন্ন প্রবহমানতায় অবগাহনের সাক্ষ্য বহন করে। তাছাড়াও গ্রন্থোৎপত্তির কারণ থেকে শুরু করে কাহিনির প্রতিটি অংশ দেবী চণ্ডীকার জয়গাথায় স্বতোৎসারিত। যেমন—

"আসন পুষ্কর্ণি আড়া নৈবেদ্য শালুক পোড়া
পূজা কৈলু কুমুদ প্রসূণে।
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেইখানে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।।
হাতে লইয়া পত্রমসী আপনি কলমে বসি
নানাছন্দে লেখেন কবিত্ব।
যেই মন্ত্রে দিল দীক্ষা সেই মন্ত্র করি শিক্ষা
মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য ।।
দেবী চণ্ডী মহামায়া দিলেন চরণ ছায়া
আজ্ঞা দিলা রচিতে সঙ্গীত।"[১৫]

দেবী চণ্ডীকার আদেশ শিরোধার্য করে মুকুন্দ তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চণ্ডীর মহিষাসুরমর্দিনী রূপের বর্ণনা করা হয়েছে। কাব্যের অন্তর্গত কালিদহে 'কমলেকামিনী' একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অংশ। ধনপতি সদাগর উপাখ্যানে দেবী চণ্ডিকার 'কমলেকামিনী' রূপ বর্ণনা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিদের কবিত্বকে একটি বিশেষ মাত্রা এনে দিয়েছে। মুকুন্দের 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যে তারই রূপাঙ্কন লক্ষ্য করা যায়—

"অপরূপ দেখ আর ওহে কর্ণধার
কামিনী কমলে অবতার।
ধরি রামা বাম করে সংহারয়ে করিবরে
উগারিয়া করয়ে সংহার।।"[১৬]

দ্বিজ রামদেব হিমালয় নন্দিনী দেবী দুর্গারূপে চণ্ডীকার কমলেকামিনী রূপটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন--

"কমল কোরকদলে কামিনী বসিয়া হেলে
গজরাজ সংহারে পদ্মিনী।

কি যে দেখি অপরূপ বিদরে আন্ধার বুক
যেন দেখি হিমালয় নন্দিনী।।...
খেলে করিরাজ ধরি খেলে পাছারিয়া মারি
খেনে খেনে গগনে উতারি।
ও কী বিস্তারিয়া অতি ও কী ধরে মুখপাতি
ও কী কি কমলে কুমারী।।"[১৭]

মঙ্গলকাব্যের আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল চৌতিশা স্তব। মঙ্গলকাব্যের ব্যাখ্যায় এই চৌতিশা স্তবগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কলিঙ্গরাজের কারাগারে কালকেতুর চৌতিশা, সিংহল রাজের কারাগারে শ্রীমন্তের চৌতিশা, 'কালিকামঙ্গলে' সুন্দরের চৌতিশা স্তবে দেবীর ভীষণা, খর্পরধারিণী মূর্তিই ফুটে উঠেছে। বলা যায় বিভিন্ন কবিদের কাব্যে দেবীর সনাতনী রূপ চৌতিশা স্তবে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণরাম দাসের 'কালিকামঙ্গলে' সুন্দরের চৌতিশা স্তবে আছে—

"করজোড়ে কবিবর করে পরিহার।
কর গো করুণাময়ী কৃপা একবার।।...
গিরিসুতা গুণমালা গহনভাষিনী।
গলে রণ মুণ্ডমালা গগনবাসিনী।।
ঘোরতর বাদিনী শরণ দেব শিবা।
ঘুষিতে রহুক ক্ষিতি যন্ত্রণা না করিবা।।"[১৮]

ভারতচন্দ্র মশানে সুন্দরকে দিয়ে কালীর স্তব স্তুতি করিয়েছেন এবং অ-থেকে ক্ষ পর্যন্ত পঞ্চাশটি বর্ণে দীর্ঘ চৌতিশা স্তব করিয়েছেন। 'চৌরপঞ্চাশিকায়' পঞ্চাশটি শ্লোকে রচিত দীর্ঘ স্তবগুলি দ্ব্যর্থবোধক। ভারতচন্দ্র সুন্দরের মুখে অ ধ্বনি দ্বারা শক্তিদেবীর নামের বিভিন্ন প্রতিশব্দ দ্বারা দীর্ঘ শ্লোক রচনা করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আমরা এখানে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃতি হিসেবে নিচ্ছি—

"অর্পণা অপরাজিতা অচ্যুত অনুজা।
অনাদ্যা অনন্তা অন্নপূর্ণা অষ্টভুজা।।
আদ্য আত্মরূপা আশ পুরাহ আসিয়া।
আনিয়াছ আপনি আমারে আজ্ঞা দিয়া।।"[১৯]

আবার কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কাব্যে দেখি—

"কালী কপালিনী কান্তা কপালকুণ্ডলা।
কালরাত্রি কুন্দমুখী কত জাত কলা।।...
গিরিজা গণেশ মাতা গতি সবাকার।
গোকুল রাখিলে গোপকুলে অবতার।।"[২০]

কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'ষষ্ঠীমঙ্গল' এবং 'শীতলামঙ্গল' দুটি কাব্যেই দেবী দুর্গার জায়গাথা কীর্তিত হয়েছে। এখানেও চৌতিশা স্তব লক্ষ্য করা যায়। যেমন - 'শীতলামঙ্গল' কাব্যে কবি শীতলার চৌতিশা স্তবে দুর্গার-স্তব বন্দনা করেছেন। —

"দুর্গা দুর্গা পারা দক্ষমক্ষ হরা
দুর্গতি রাখহ দীনেরে।
মস্তক মালিনী মুকুট ধারিণী
মহিষ মুন্ডনাশিনী।।
বিধি বিষ্ণু মায়া বিধি বিষ্ণু প্রিয়া
বরণমই বিষ্ণুধাতা।
সংখিনী শূলিনী সঙ্কর গৃহিণী

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 04
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 20 - 30
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শৈলসুতা শিবদাতা।।”[২১]

মহাশক্তির ভয়ঙ্করী, চামুণ্ডা মূর্তিও কবিরা অঙ্কন করেছেন। প্রাসঙ্গিকতার নিরিখে কবি কল্পনার এই বৈশিষ্ট্যও উল্লেখ্য। কবিশেখর বলরাম দাস তাঁর ‘কালিকামঙ্গল’ কাব্যে মহাদেবীর চামুণ্ডা রূপের বর্ণনা করেছেন -

“কাতি কর্পর হাতে মুণ্ডমালা গলে।
শোভা করে সরোবর শ্রবণ মণ্ডলে।।
দ্বীপি চর্ম পরিধান অতি শুষ্ক দেহা।
নিরবধি লহ লহ করে তার জিহ্বা।।
চৌদিকে বেষ্টিত শিবা করয়ে গর্জ্জন।
চাঁদ চকোর আঁখি শবে আরোহন॥”[২২]

বস্তুত শক্তির দেবী চরণ বন্দনায় মঙ্গলকাব্যের গীত মুখরিত হয়েছে বারংবার। সেখানে কবি কল্পনার ঘাটতি যাই থাকুক না কেন, মাতৃরসের কোন অপ্রতুলতা ছিল না।

‘কমলামঙ্গলের’ কবি কৃষ্ণরাম দেবী কমলাকে জগতের আদ্যাশক্তি রূপে তাঁর কাব্যে উল্লেখ করেছেন। ব্যাঘ্রভীত আর্ত সাধু কমলার চরণে শরণ নিয়ে বলেছে—

“সদাগর বলে রাজা শুন এই হিত।
লক্ষ্মীর চরণ ভাব হইয়া একচিত।।
সকলের শক্তি তিনি জগতের মাতা।
সত্বরে কহিনু রাজা এই সত্যকথা।।”[২৩]

রাজাও স্তব বন্দনায় দেবী কমলাকে তুষ্ট করতে চেয়েছেন এই বলে —

“জগত জননী তুমি সনাতনী একা
সদয় হইয়ে নিজ রূপ দিয়া দেখা।।...
ব্রহ্মা বিষ্ণু হর যারে নিত্য পূজা করে।
তাহারে করিতে স্তব কোনজন পারে।।”[২৪]

অন্যত্রও কবি কমলাকে আদ্যাশক্তি বলে বর্ণনা করেছেন। —

“কৃপাময়ী জগতি বিষ্ণুর জায়া।
যত দেখি সকলি ঐ জননীর মায়া।।...
পরম ঈশ্বরী ইনি জগতের মা।।”[২৫]

বস্তুতপক্ষে তৎকালীন বাংলাদেশে চণ্ডী, মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতির মতো কালিকা, বাসুলি, কমলা সমস্ত দেবী শক্তিই বিশ্বজগতের কারণ সম্ভূতা আদি শক্তিরূপে পূজিতা ও বন্দিতা হয়েছেন। করুণাময়ী, মঙ্গলদাত্রী এই দেবী শক্তিরই অন্য এক রূপে চিত্রিত হয়েছে উপরোক্ত ‘চণ্ডীমঙ্গল’, ‘অন্নদামঙ্গল’ এবং ‘শিবায়ন’ কাব্যে। সেখানে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ সম্ভূতা মহাশক্তিকে কখনও ঘরের মেয়ে উমা, কখনও বা বিশ্ব হিতৈষিনী জগন্মাতা অভয়া বা অন্নদা রূপে কল্পনা করা হয়েছে।

তান্ত্রিক আচার ও সংস্কারের ব্যবহার মঙ্গলকাব্যগুলিতে নেই। তবে তন্ত্রশাস্ত্র ও তান্ত্রিক রূপের পরিচয় বিভিন্ন রূপক ও প্রতীকের মাধ্যমে অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্তপদাবলির বিভিন্ন পর্যায়গুলিতে ফুটে উঠেছে। শাক্ত পদাবলিতে জগন্মাতা কালীকে বর্ণময়ী বলা হয়েছে। ষটচক্রের বিভিন্ন চক্রে অবস্থিত পদ্মদলগুলিতে বিভিন্ন বর্ণের অবস্থান। কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণের মধ্যে দিয়ে সহস্রার সহস্রদল পদ্মে শক্তিকে চালনা করে শিব ও শক্তির মিলন ঘটানোই ষটচক্র সাধনা। মঙ্গলকাব্যের নায়কের সুকঠোর চৌতিশা স্তবে বস্তুতপক্ষে বর্ণময়ী কালিকারই স্তব করা হয়েছে। শাক্তপদাবলিতে জগজ্জননীর প্রতি সন্তানের অনুযোগ, অভিযোগ দেখা যায়। ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গলে’ হরিহোড়ের দারিদ্র্য, দেবীর প্রতি অবিশ্বাস, অনুযোগ, ঈশ্বরী পাটনীর প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে দেবতার প্রতি ভক্তের ইচ্ছাপূরণের আকাঙ্ক্ষা সূচিত হয়েছে, যা পরবর্তীকালে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 04
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 20 - 30
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রসমূর্তি ধারণ করেছে। মঙ্গলকাব্যের ভিন্নতর পরিসরে যা টুকরো টুকরো আকারে ছিল, 'কালিকামঙ্গলে' এসে তা কালজয়ী কবিপ্রতিভার স্পর্শে বিশিষ্ট কাব্যরূপ পেয়েছে।

'কালিকামঙ্গল' তথা 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যধারাটি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্ব থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর সময়পর্ব পর্যন্ত একচ্ছত্র চর্চার মাধ্যমে নিজের স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় রেখে গেছে। পাশাপাশি কবি জীবন এবং সমকালীন যুগধর্মকে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে কাব্যগুলি সমালোচকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষভাবে বলা যেতে পারে, ইংরেজ আগমনে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা তথা ভারতীয় জন-জীবনে যে সার্বিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল তার যথার্থ দলিল ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের 'কালিকামঙ্গল' তথা 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য। এছাড়াও মঙ্গলকাব্যধারার বিষয় নির্বাচনে আলোচ্য কাব্যধারায় কবিরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র্যতার পরিচয় রেখেছেন। তাঁরা দেব-দেবীর প্রাধান্যের স্থলে মানব-মানবীর সম্পর্ক মূলত দৈহিক সম্পর্ককেই প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলেন। তাই সার্বিক দিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের ধারায় 'কালিকামঙ্গল' অন্যান্য প্রধান ধারার মঙ্গলকাব্যের মতই একটি। এমনকি অন্যান্য প্রধান মঙ্গলকাব্যের মতই দুশো-আড়াইশো বছর ধরে 'কালিকামঙ্গল' কাব্য রচনাও অব্যাহত ছিল। বিষয়টি পাঠক এবং সাধারণ মানুষের হৃদয়ে কাব্যের জনপ্রিয়তাকেও প্রমাণ করে। এছাড়াও বিষয় ও চরিত্র নির্মাণে বিভিন্ন কবির কৃতিত্ব আলোচনার মাধ্যমে আমরা এই কাব্যধারার স্বতন্ত্রতা দেখাতে চেয়েছি পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে। তাই কোনোদিক থেকেই প্রধান মঙ্গলকাব্য হতে 'কালিকামঙ্গল' কোন অংশে কম নয়, সে কথা মেনে নিতে অসুবিধা হয় না। এছাড়াও 'কালিকামঙ্গল' তথা 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যগুলিকে বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট মঙ্গলকাব্য হিসেবে পরিচয় না দিয়ে, কাব্যগুলিকে মঙ্গলকাব্যেরই এক স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট কাব্যধারা বলা যেতে পারে।

Reference:

১. জলিল, মুহম্মদ আব্দুল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বাংলা ও বাঙালী সমাজ, বাংলা একাডেমি, প্রকাশকাল, ১৯৮৬, পৃ. ২৬২ - ৬৩

২. শরীফ, আহমদ, মধ্যযুগের সাহিত্যের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, মুক্তধারা, প্রকাশকাল, ১৯৭৭, পৃ. ৯৬

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

৪. বন্দোপাধ্যায়, অসিত কুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (দ্বিতীয় খন্ড), মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, প্রকাশকাল, ২০১৫-১৬, পৃ. ২৮

৫. প্রাগুক্ত, (তৃতীয় খণ্ড/ প্রথম পর্ব), পৃ. ২

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত), ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা-৬, প্রকাশকাল আশ্বিন - ১৪২১, পৃ. ১৫

৮. মুখোপাধ্যায়, ড. অনিমা, আঠারো শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ, সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ, ১৩৯৪, পৃ. ২৭

৯. ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ, (সম্পাদিত), কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশকাল, ২০১১ পৃ. ভূমিকা ক. ২৭

১০. দাসগুপ্ত, জয়ন্তকুমার, (সম্পাদিত), বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশকাল, ২০০৯, পৃ. ৬২

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

১২. রায়, বসন্তরঞ্জন, (সম্পাদিত), কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, প্রকাশক পাওয়া যায়নি, প্রকাশকাল, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৫

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

১৪. ওঝা, সুনীলকুমার, (সম্পাদিত), মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, প্রকাশকাল, ১৯৬৯, পৃ. ১৫

১৫. সেন, সুকুমার, (সম্পাদিত), কবিকঙ্কন মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য একাডেমী প্রকাশিত, প্রকাশকাল, ২০০৭, পৃ. ১৩

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

১৭. দাস, আশুতোষ, (সম্পাদিত), দ্বিজ রামদেবের অভয়ামঙ্গল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশকাল, ১৯৫৭, পৃ. ৬৭

১৮. ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ, (সম্পাদিত), কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশকাল, ২০১১ পৃ. ৪৩

১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত), ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা-৬, প্রকাশকাল আশ্বিন, ১৪২১, পৃ. ২২৩

২০. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত), কবিকঙ্কন মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য একাডেমী প্রকাশিত, প্রকাশকাল, ২০০৭, পৃ. ১১৩

২১. ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ (সম্পাদিত), কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশকাল, ২০১১ পৃ. ১৫৫

২২. কাব্যতীর্থ, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, (সম্পাদিত), কালিকামঙ্গল বলরাম কবিশেখর বিরচিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রকাশকাল, চৈত্র ১৩৫০, পৃ. ১৩

২৩. ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ, (সম্পাদিত), কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশকাল, ২০১১ পৃ. ১৫৭

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮